# তোতারাম গঙ্গারাম

যুথিকা বড়ুয়া

আশা-ভরসা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে সংসারে। বিশেষ করে মা-বাবা। সন্তানের জন্মলগ্ন থেকেই কতনা স্বপ্নীল আকাঙ্খা তাদের মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হতে শুরু করে! যাদের উচ্ছাসিত আনন্দের প্রবাহকে নদীর স্রোতের মতো অনন্ত ধারায় এগিয়ে নিয়ে চলে তাদের কাঙ্খিত মোহনার দিকে। যা কখনোই স্তব্ধ হতে দেয়না! সন্তানের আনন্দেই মা-বাবার জীবনে প্রকৃত সুখ-শান্তি সর্বদা বিরাজ করে। অথচ সেই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষৎ চিন্তায় অন্তবিহীন পথ চলতে চলতে মা-বাবা কখন যে যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বে, আর প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্দ্ধক্যে পৌঁছে যায়, তা অনেক সন্তানেরই দৃষ্টিগোচর হয়না! আর হলেও কখনো তা গ্রাহ্য করেনা এবং মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালনে কার্পণ্য করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হয়না। কারণ বোধশক্তির অভাবে তারা গহীন অনুভূতি দিয়ে কখনো উপলব্ধি করে না যে, শুধু লালন-পালন আর ভরণ-পোষণই নয়, মা-বাবা বহু কষ্ট স্বীকার করে, নিজেদের সাধ-আহাল্লাদ বিসর্জন দিয়ে, অত্যন্ত স্বযত্নে স্নেহ-মমতার ছায়ায় সন্তানদের বুকে আলগে রাখে এবং অদূর ভবিষ্যতেও তাদের প্রতি কতখানি আশাবাদী এবং নির্ভরশীল! যার প্রকৃত মূল্যায়নের অভাবে জীবনের অমূল্য সম্পদ এবং পরমপূজ্য সেই মাতা-পিতাই যখন পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়, তখন নিজেকে সংশোধন করবার অবকাশও আর থাকে না! মাথাকুটে কেঁদে মরে গেলেও তাদের কোনদিন আর ফিরে পাওয়া যায় না!

অনেক বছর আগের কথা। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর কোচিং ক্লাস করতে যেতাম এক প্রাইভেট্ টিউটরের বাড়িতে। যাবার পথে বিরাট একটা ঝিল পেরিয়ে যেতে হতো। তখন ছিল গ্রীস্মকাল। বিকেল হলেই পাড়ার কিশোর-কিশোরীরা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে সাঁতার রেস দিতে নেমে পড়তো ঐ ঝিলে। এককালে যেটা 'কলাবতী' নামে একটি প্রসিদ্ধ নদী ছিল! শুনেছি, ঐ নদীতে না কি তৎকালীন রাজা-বাদশাদের শৌখিন-বিলাসীতার মহরৎ চলতো! চলতো প্রেমলীলা! পরবর্তীতে অবস্থার বিবর্তনে ক্রমান্বয়ে অপব্যবহারে চড় পড়ে ভরে গিয়ে একটি বিরাটাকারের ঝিলে পরিণত হয়! বর্তমানে সেটাই 'কাকঝিল' নামে পরিচিত!

একদিন দূর থেকে দেখি, ঐ ঝিলের চারদিকে লোকে লোকারণ্য! সবাই উপুর হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ সমবেদনা জানিয়ে, 'ইস্ রে, আহা রে!' বলছে, শোনা যাচ্ছে। স্বভাবসুলভ কারণে প্রচন্ড উৎসুক্য নিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করি। কাছাকাছি পৌঁছোতেই লক্ষ্য করলাম, চোখেমুখে কারো আবেগের প্রবণতা নেই! উদ্বেগ নেই! কাউকে উৎসাহী বা উত্তেজিত বলে মনেও হচ্ছে না! অথচ নির্বিকারে সবাই তামাশা দেখছে। তার মধ্যে কয়েকজন প্রৌঢ়ামহিলা উৎকন্ঠিত হয়ে বলছে, 'ইস্, ঠান্ডা লেগে ছেলেটা মরে যাবে যে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি তোমরা তামাশাই দেখবে সবাই! একটু মায়াও হচ্ছে না কারো! হাঁ করে দেখছ কি! যাও, তোমরা কেউ নেমে শীগ্‌গির টেনে তোলো ওকে!'

তখন বুঝলাম, নিশ্চয়ই কেউ পড়ে গিয়েছে ঝিলে! দিলাম উর্দ্ধঃশ্বাসে এক দৌড়! দৌড়ে গিয়ে দেখি, সে এক অবাক কান্ড! রীতিমতো হাস্যকরও বটে! বছর আটেকের এক সুংসাহসী নাবালক ডুব দিয়ে আছে জলে। কখনো তিমি মাছের মতো ভেসে উঠে চোখের পলকেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা লোক দেখানোর জন্য নয়! মায়ের অবাধ্যতা এবং বেপরোয়ার কারণে ওর ঐ নিমর্ম পরিণতি! দেখলাম, কাঁচাবাঁশের সরু একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে ঝিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের পেশিগুলোকে শক্ত করে ফুলিয়ে রাগে গজ্‌গজ্ করছেন ওর মাতা অন্নপূর্ণা দেবী। ছেলে জল থেকে উঠে এলেই পড়বে ওর পাছার ওপর দমাদম বেতের বারি। কিন্তু কতক্ষণ! অন্নপূর্ণা অদৃশ্য হয়ে যেতেই বালকটি চুপি চুপি জল থেকে উঠে এসে ভিজে বিড়ালের মতো প্রাণপণে দেয় দৌড়!

বালকটির নাম গঙ্গারাম। তো তো স্বরে কথা বলতো আর খুব তোতলাতো। তাই ওর নামকরণ হয়, তোতারাম গঙ্গারাম! ওরা তিন-ভাইবোন! দুইদিদির আদরের ঐ একটিই ছোটভাই, ওদের চোখেরমণী! আর মায়ের তো কলিজার টুকরো! আদর করে ওকে গোঙ্গু বলে ডাকতো। কিন্তু যেমন চঞ্চল, অস্থির চিত্তের, তেমনি লেখাপড়ায় ছিল অষ্টরম্ভ, অমনোযোগী! গ্রাহ্যই করতো না কাউকে! এক এক ক্লাসে দু'বছর না পড়লে পাশই করতে পারতো না পরিক্ষায়! ওদিকে বেলেল্লাপণাতেও কম পারদর্শী ছিলনা! রাত পোহালেই শুরু হয়ে যেতো নিত্যনৈমিত্তিক তুলকালাম কান্ডের পুনরাবৃত্তি! ওকে যে কোণ্ ধাতূ দিয়ে বিধাতা গড়েছিলেন,

ডর-ভয়, লজ্জা-শরমের বিন্দুমাত্র বালাই ছিলনা! একেবারে পশু-পাখীর চেয়েও অধম! পশু-পক্ষীরাও নিজেদের আরাম বোঝে! শান্তিপূর্ণ নির্জন নিড়িবিলি জায়গা ওরাও খোঁজে! দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্য্য অস্তাচলে ঢলে পড়লেই ওরাও যথাসময়ে ফিরে আসে আপন ঠিকানায়। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র গোঙ্গুর বেলায়। নামমাত্রই লেখাপড়া। ছুটির ঘন্টা বেজে উঠলেই চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যেতো। পাত্তাই পাওয়া যেতো না ওর! বইয়ের ব্যাগটা কোনো গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে পাড়ায় পাড়ায় অলি-গলিতে টো টো কোম্পানী করা শুরু হয়ে যেতো। শিকারী হায়নার মতো আম-জামরুলের সন্ধানে চড়কির মতো চোখদু'টো ওর চারিদিকে ঘুরতো। কোনদিন ঘু ঘু ডাকা নির্জন দূপুরে তরতর করে বেয়ে লোকের আমগাছে উঠে পাখীর মতো খুঁটে খুঁটে পাকা আমগুলিই বেছে বেছে খেতো। আর খেয়ে খেয়ে আমের আঁটিগুলি ছুঁড়ে ফেলতো আশে-পাশের ঘর-গৃহস্থের চালের উপর। কখনো বড় বড় পাথর কিংবা ঢিল ছুঁড়ে চালের টালিই ভেঙ্গে দিতো! ওদিকে ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে যেতো ওর মায়ের! চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠতেন তিনি! গোঙ্গু বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত ভয়ে আশঙ্খায় মন্ত্রের মতো মনে মনে জপতেন, 'এই বুঝি পাড়ার লোকেরা স্বদলবলে নালিশ নিয়ে এলো বোধহয় ওর মায়ের পিন্ডি চটকাতে! মায়ের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতে! ভগবান, মরণও কেন হয় না আমার!'

ইতিপূর্বেই গোঙ্গুর উপদ্রপ, অত্যাচারে পাড়ার বিক্ষিপ্ত মহিলারা কোমড় বেঁধে বিহিত করতে ছুটে আসতো। কিন্তু গোঙ্গুকে না পেয়ে ওর মায়ের সঙ্গেই তুমুল বাকযুদ্ধ শুরু করে দিতো! কেউ কেউ তীব্র উপহাস করে বলতো, -'বান্দর একখান্ তো পুইষ্যা রাখছ, হ্যাড়ে ছাইর‍্যা দিছ ক্যান বাইরে! মাইনষের যে অনিষ্ট কড়তাছে, খবর রাখো কিছু! থাকো ক্যাম্নে নিশ্চিন্তে! বেআক্কল, বেশরম!'

আর এভাবে দিনের পর দিন পাড়ার লোকের কাছে অপদস্থ আর অপমানিত হতে হতে ক্ষোভে, দুঃখে একেবারে অতিষ্ট করে তুলেছিল অন্নপূর্ণাকে! আর দিদিরা তো তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ওর নামই মুখে নিতো না কেউ। কিন্তু ওর মায়েরই হয়েছিল যত জ্বালা! না ফেলতে পারতেন না সইতে পারতেন।

অবশেষে একদিন নিরুপায় হয়ে বাধ্যতামূলক শহর থেকে প্রায় তিন'শ কিলোমিটার দূরে এক বোডিং-স্কুলে এমন চুক্তিবদ্ধভাবে দাখিল করে দিলো, যাতে কোনদিন আর মা-বোনের দর্শণ না পায়! এমনকী পূজোর ছুটিতে বাড়ি আসাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল! অথচ নির্বোধ নাবালক গঙ্গারাম, মা-বোনের বিচ্ছেদে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলনা ওর চোখেমুখে। কোনো ভাবান্তর হলো না। এতটুকু কষ্ট হলো না। মুহূর্তের জন্যও মলিন ম্রিয়মান করলো না ওর মনকে! বরং উৎফুল্ল হয়ে উঠল আনন্দে। মনে মনে বলল, -উফঃ, কি মজা! কেউ শাসন করবার থাকবে না। কেউ বাঁধা দেবার থাকবে না। মনের সাধ মিটিয়ে ইচ্ছেমতো ও' ঘুরে বেড়াতে পারবে।

অথচ গোঙ্গুর জানাই ছিলনা যে, বোডিং-স্কুলের নিয়মকানুন এবং শাসন-শিক্ষা ব্যবস্থা কত কঠোর! কত জটিল! যেখানে ফাঁকি দেওয়া খুবই দুস্কর! ধরা পড়লে আর ক্ষমা নেই! বহিঃস্কার অবধারিত! অথচ কারাগারের মতোই একরকম ঘড়ি ধরে রুটিনমাফিক বন্দি জীবন! একত্রে দলবদ্ধ হয়ে আড্ডা দেওয়াও নিষিদ্ধ! যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, আন্তরিকতা নেই! ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসারও কোনো কদর নেই! সবই নিমিত্ত মাত্র! যেখানে টিকে থাকাই খুবই মুশকিল ছিল গোঙ্গুর জন্য!
কিন্তু মানুষ পরিবর্তনশীল। বয়সের সাথে সাথে শুধুমাত্র শারীরিক আর মানসিক পরিবর্তনই নয়, জীবনের রূপই বদলে যায় মানুষের! তদ্রুপ জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশে খানিকটা বোধগম্য হতেই একাকী নিঃসঙ্গতায় দেহ-মনে ক্লান্তি আর অবসাদে গোঙ্গুকে যখন আচ্ছন্ন করে ফেলল, তখন অতীতের হাসি-কাঁন্না আর কোলাহলের আনন্দ মুখরিত দিনের অম্লান স্মৃতিগুলিকে কল্পনায় ফিরিয়ে এনে মরমে মরমে উপলদ্ধি করেছিল, এ যেন এক অভিশপ্ত জীবন! নির্বাসিত জীবন! এর চেয়ে তো বরং নিজের মায়ের হাজারটা বেতের বারিই অনেক ভালো ছিল! প্রচন্ড আঘাত পেলেও মায়ের স্নেহমিশ্রিত কোমল স্পর্শে পিঠের ওপর হাতটা বুলিয়ে দিলেই সমস্ত ব্যাথা-বেদনা নিমেষেই দূর হয়ে যেতো। আর তার পরমুহূর্ত্যেই বুকে মাঝে জড়িয়ে ধরে মা আমায় খুব আদর করতো! কপালে গালে চুমু দিতো। ভাবতে ভাবতে অস্ফূট স্বরে গোঙ্গু আর্তনাদ করে উঠল, -'মা, মাগো! তুমি কোথায় মা! কেন এতবড় শাস্তি আমায় দিলে মা! আমার জন্য একটু প্রাণও কি তোমার কাঁদে না মা! এখানে যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে মা! ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে তোমায়! কবে আসবে মা!'

গোঙ্গু অনুভব করে, জীবন যেন ওর থেমে গিয়েছে! কিছুতেই মন লাগতো না! নিয়মিত নাওয়া-খাওয়াও করতো না। পড়ন্ত বিকেলে সূর্য্য ডুবে গেলেই ক্রমশ ঘনিয়ে আসতো অন্ধকার। চারিদিক কেমন নিঝুম, নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যেতো। কারো সাড়া শব্দ পাওয়া যেতো না। বিষন্নতায় স্মৃতিকাতর গোঙ্গুর তখন মানসিক একটা শূন্যতায় ঘুমই হতো না রাতে! অগত্যা মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে নিরীহ গোবেচারার মতো হাত-পা কুঁকড়ে পড়ে থাকতো বিছানায়।
কিন্তু মনে মনে ওর বড্ড অভিমান হয়! মনস্থির করে, মা-বোন কেউ নিতে না এলে কোনদিনও আর বাড়ি যাবে না। ও' এমন কি অপরাধ করেছিল যে, ওর মুখদর্শণই করতে চায় না কেউ!
গোঙ্গুর মনে পড়ে, ওর শৈশবের খেলার সাথী ঝন্টুও তো খুব দুরন্ত ছিল! মা-বাবার অবাধ্য ছিল। প্রতিদিন ঘরের জিনিসপত্র অনিষ্ট করতো। ভাঙ্গচূড় করতো। ছোটবোন পিঙ্কির সঙ্গেও মারামারি করতো। ওর চুল টেনে দৌড়ে পালাতো। আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে নাকে কাঁদতো পিঙ্কি। কই নিষ্ঠুর স্বার্থপরের মতো চোখের আড়াল করে ঝন্টুকে তো বোডিং-স্কুলে ফেলে রাখেনি ওর মা-বাবা! আর গোঙ্গু তো চোখেই দ্যাখেনি কোনদিন ওর বাবাকে! মায়ের কাছে শুনেছে, ওর জন্মের বহু আগে থেকেই তিনি পরলোকের বাসিন্দা। এ জীবনে পিতৃস্নেহ-মমতা-ভালোবাসা যার কপালেই জোটেনি, তার ভালো-মন্দের কিইবা মূল্য আছে জীবনে! তাকে কেউ ভালোবাসে না কোনদিন! কিন্তু মায়ের জন্য গোঙ্গুর কি মন প্রাণ কাঁদে না! একটু দেখতেও কি ইচ্ছে করে না ওর কাউকে!

কিন্তু সেখবর গোঙ্গুই বা জানবে কি করে! ওর অনুপস্থিতিতে পাড়ার উৎপাত উপদ্রপ বন্ধ হয়ে গেলেও পুত্রবিরহে রীতিমতো রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে ওর মমতাময়ী মা অন্নপূর্ণা দেবী। ক্রমে ক্রমে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তিনি। অথচ মাতৃস্নেহ বঞ্চিত হতভাগা গোঙ্গুকে চোখের আড়াল করে দূরে সড়িয়ে রেখেছিল, প্রতিদিনকার হৈ চৈ কোন্দল অশান্তির যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পেতে! কিন্তু একটাদিনও শান্তি পায়নি অন্নপূর্ণা! উপরন্তু নানান দুঃশ্চি ন্তায় তাকে আষ্টে-পাষ্টে ফিরে ধরলো। তবু বুকের মাঝে পাথর চাপা দিয়ে সহে গিয়েছিল, গোঙ্গুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। চেয়েছিল, ছেলেটা অন্তত বড় হোক, মানুষ হোক! ভালো-মন্দ বুঝতে শিখুক! নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক! কিন্তু উচ্চাকাঙ্খিত সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই অন্নপূর্ণা যে চিরদিনের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বে, তা কে জানতো!
পুত্রবিরহে কাতর এবং মুহ্যমান হয়ে অন্নপূর্ণা বিছানায় শয্যা নিয়ে একদিন আচমকা হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে! সংবাদ পেয়ে গোঙ্গু মরিয়া হয়ে উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে আসে। আর্তচিৎকার করে দু'হাতে বুক চাপড়াতে থাকে। মৃত মায়ের পা-দু'খানি জড়িয়ে ধরে বিলাপ করে বলে, 'মা, মাগো! তুমি আমার ওপর অভিমান করে চলে গেলে মা! চোখ খোলো, দ্যাখো, আমি তোমার গোঙ্গু! ফিরে এসেছি! তোমার গোঙ্গু এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে মা! কখনো আর অবাধ্য হবে না! মা মাগো, কেন একটিবার আমায় জানালে না মা! শেষবারের মতো তোমার কোলে মাথা রেখে কথা বলার সুযোগও কেন একবার আমায় দিলে না মা, মাগো!' বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের প্রাণহীন নিথর দেহের উপর আঁছড়ে পড়লো গোঙ্গু।
এই তো মানুষের জীবন! দু'দিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কাঁন্না, আনন্দ-বেদনার এ জীবন! শুধুমাত্র মায়ার খেলা! কিন্তু একজন গর্ভধারিনী মায়ের বুক উজার করা আদর-স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা? সেও কি মায়ার খেলা? মোটেই নয়! সেটা হলো মাতৃত্বের একাত্ম বন্ধন! আপন গর্ভে লালিত সন্তান আর মায়ের নারীর চিরন্তন বন্ধন! এক অবিচ্ছেদ্য টান! যা মৃত্যুর পরও কখনো ছিন্ন হয়ে যায়না! আর যায়না বলেই সেই ঝিলের পাশে দাঁড়ালে দূর থেকে দেখা যায়, যার প্রমাণসরূপ স্মৃতিরসৌধ নির্মিত একটি বিশাল কারুকার্যময় মন্দিরের চূড়া! যে মন্দিরের সদর দরজার উপরে শ্বেতপাথরে খোদাই করা বিরাট অক্ষরে লেখা, 'মাতৃ মন্দির অন্নপূর্ণা।' যেখানে আজও প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যে ফুল-বেলপাতা চড়িয়ে, ধূপ-ধূনো জ্বালিয়ে, কাঁসা-ঘন্টা বাজিয়ে কায় মন বাক্যে গোঙ্গু কামনা করে, ওর মৃত মায়ের আত্মার পরম শান্তি!

সমাপ্ত

*যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।*
guddi_2003@hotmail.com